***International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)***
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 01-06*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.vol.6.issue.05W.062**

# টেরাকোটার গ্রাম আঁটপুর ও দ্বারহাট্টা

**অরিন্দম গায়েন**
*সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নেতাজী সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ*

***Abstract:***

*Antpur and Dwarhatta are two famous terracotta villages in the Hooghly district of the Indian state of West Bengal. These two villages are the part of Burdwan division. Not only our India but also the world knows the name of Antpur for its unique terracotta tradition. There are numerous terracotta temples here, the most notable of which is the temple of Radha-Govind-Jiu Mata. This temple was once the seat of religious culture. One of the most notable attractions here is the assimilation of terracotta of burnt clay and terracotta of wood carpentry simultaneously. In addition to the Radha-Govind-Jiu temple, there are five other Shiva temples, and there are Chandimandap, Natmandir, Nahabatkhana and Dwarikachandi Mata Mandir and Sri Sri Rajarajeshwar Mandir in Dwarhatta. Many tourists, devotees and foreigners come to see the temple. Antpur boasts of to possess a bokal tree which is about 400 years old. There is Ramakrishna Math and Premananda Ashram here. Swami Vivekananda and his nine brothers took sannyas here. Mother Sarada Devi stayed in the house of Swami Premananda. Durgapujo of Ramakrishna Math is very famous. Although it is a village by name, like Rajbalhat it is called "Adha-Nagar".*

***Keywords: Radha-Govind-Jiu Mandir, Sitaram Mandir, Baneswar Mandir, Jaleswar-Phuleswar Shib Mandir, Gangadhar Mandir, Rasmancha, Dolmancha, Bakul Gach, Ramakrishna Math, Aatchala Chandi Mandap, Natmandir, Dhuni Mandap, Dwarika Chandi Mandir, Rajrajeshwar Mandir.***

**আঁটপুর:** ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়া থানা ও ব্লকের এলাকাধীন একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আঁটপুর। পূর্বে আঁটপুর একটি রেলস্টেশন ছিল। এই স্টেশনটি ছিল হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা রুটের রেলপথের উপরে। পূর্বে হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন কোম্পানির রেলে আঁটপুর স্টেশনে নামা যেত। এখন হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল স্টেশন থেকে নেমে বাস বা ট্রেকারে করে সহজেই আঁটপুর যাওয়া যায়। এটি তারকেশ্বর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কলকাতা থেকে আঁটপুরের দুরত্ব প্রায় ৬৫ কিমি। প্রাচীনকালের এই গ্রাম ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তভূর্ক্ত ছিল। অতীতে এই স্থানের নাম 'বিষখালি' ছিল। আঁটপুর নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ প্রচলিত আছে। আঁটপুর গ্রামটি আঁটটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত, এই আঁটটি গ্রাম আজও বিদ্যমান। গ্রামগুলি হল : তড়া, বোমনগর, কোমরবাজার, ধরমপুর, আনারবাটি, রানীরবাজার, বিলাড়া ও লোহাগাছি। কথিত আছে, এই অঞ্চলে

ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজার আট সেনাপতি বাস করতেন বলে গ্রামটির আঁটপুর নামকরণ হয়। অন্য মতে বলা যায়, মুসলমান রাজত্বকালে এই স্থানে দুজন জমিদার বাস করতেন। তারা হলেন আঁনোর খাঁ ও আঁটোর খাঁ। তাদের নামানুসারে আনারবাটি ও আঁটপুর নামকরণ হয়েছে। এই গ্রামে দক্ষিণে আনারবাটি নামে একটি গ্রাম আছে। বৈষ্ণবদের জন্মভূমি এই অনারবাটি গ্রাম। এই গ্রামে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেব অবস্থান করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য এর বন্ধু পরমেশ্বরদাস ঠাকুর এখানে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মূর্তি এখানকার ঠাকুরবাড়িতে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু এই স্থানে কোনো মুসলমান বাস করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোনো ধারণা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। একদা এই গ্রাম তাঁত শিল্পের জন্য যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁতশিল্পের সঙ্গে এই অঞ্চলটি একসময়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও বর্তমানে উন্নতিশীল কৌশলের প্রভাবে আজ সে শিল্প ক্ষণস্থায়ী। এখানে বিখ্যাত টেরাকোটা মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

আঁটপুর গ্রামের পরিবেশ অতি মনোমুগ্ধকর। বহতা নদী এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এই গ্রাম বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। বাংলার অন্যান্য গ্রামের ন্যায় এটাও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা ছিল। সুধীরকুমার মিত্র তাঁর 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, "আঁটপুর ও তাঁর পাশাপাশি গ্রাম এক সময় খুব উন্নত ছিল। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এই স্থান এরূপ মনোরম ছিল যে, ইংরেজ রাজত্বকালে এটাকে রাজকর্মচারিগণ' একটি ছোট সুন্দর শহর' বলে ব্যাখ্যা করেছেন"[1]। এই গ্রামে বিশিষ্ট বিখ্যাত ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - 'ফার্স্ট বুক' প্রণেতা প্যারীচরণ সরকার, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ), হুগলীর দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু, ক্যাপ্টেন রসিকলাল দত্ত, নর সিংহ দত্ত, বলরাম বসু, বিপিনবিহারি ঘোষ, পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

আঁটপুরের যাবতীয় পুরাকীর্তি মন্দির, টেরাকোটা চিত্র, ছোট ছোট গ্রাম, ঠাকুরবাড়ি, রাস্তা ঘাট এখানকার প্রসিদ্ধ মিত্র ও ঘোষ বংশের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। কথিত আছে, আদিসূরের যজ্ঞে কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বাংলায় আসেন। তাদের মধ্যে কালিদাস মিত্র ছিলেন মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি জমিদার ছিলেন। এ পরিবারের তিনটি অংশে ভাগ হয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বড়িশা, হুগলী জেলার কোন্নগর ও আঁটপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। মিত্র পরিবারের বংশধর ছিলেন কন্দর্পনারায়ণ মিত্র। তিনি কোন্নগর থেকে আঁটপুরে এসে বসবাস করেন। তিনি আঁটপুরে আদি পুরুষ ছিলেন। দুর্গাপুজো ও কালীপূজো তিনি প্রথম প্রচলন করেন ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে। কন্দর্প মিত্রের পৌত্র কৃষ্ণরাম মিত্র বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ভূসম্পত্তির মালিক হন। তিনি আঁটপুরের অনেকগুলি দেবালয় নির্মাণ ও জলাশয় খনন করেছিলেন। এই দেবালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেযোগ্য হল শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মাতার মন্দির। তিনি বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে গঙ্গা জল ও গঙ্গা মাটি এনে এবং সেই গঙ্গা মাটিতে ইঁট পুড়িয়ে রাধাগোবিন্দের মন্দির তৈরি করেন।

মানবিকতা বোধের শিল্পরূপ, বিশ্ব মৈত্রীর অপূর্ব নির্দশন ও সর্ববৃহৎ টেরাকোটার মন্দিরগুলির মধ্যে একটি হল রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির। টেরাকোটা শিল্পের এক অনন্য নির্দশন এই রাধাগোবিন্দ মন্দির। এটি বিশ্বের সবথেকে বড় টেরাকোটা মন্দির। হুগলী জেলার যতগুলো মন্দির আছে তার মধ্যে রাধাগোবিন্দ মন্দির হল বৃহত্তম। ১৭০৮ শকাব্দে (১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে) মিত্রদের রাধাগোবিন্দ মন্দিরটি আটচালা রীতিতে তৈরী এবং টেরাকোটার কাজ প্রশংসনীয়। টেরাকোটার কাজের জন্য রাজা কৃষ্ণরাম মিত্র বিষ্ণুপুর থেকে মৃৎশিল্পী আনেন। মন্দিরটির প্রায় ২৫০ বছরের অধিক পুরানো। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর ছেলেবেলায় মন্দিরটি দর্শন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার পূর্বে এই মন্দিরটি দর্শন করে যান বলে শোনা যায়।

ইঁটের কারুকার্যখচিত এই রাধাগোবিন্দ মন্দির। উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট এবং পোড়ামাটির কাজ আজও প্রায় অটুট। মন্দিরটির আকার বিশাল এবং পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রণব রায় তাঁর 'বাংলার মন্দির চর্চা' গ্রন্থে বলেছেন, "সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিনটি প্রস্থে কার্নিশের নীচে এবং দেওয়ালের দুপাশে বাঁদিক ও ডানদিকে ছোট ছোট খোপে অনেক টেরাকোটা মূর্তি লক্ষ্য করা যায়"[2]। তাছাড়া মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেওয়ালেও বহু টেরাকোটা প্যানেল আছে। সামাজিক ছবি থেকে পৌরাণিক ছবি সবই দেখা যায় টেরাকোটার এই প্যানেলগুলিতে। মন্দিরের

টেরাকোটা চিত্রগুলি বিষ্ণুপুর কেও হার মানায়। টেরাকোটা ফলকগুলির মধ্যে রামায়নের যুদ্ধের কাহিনী, মা কালীর মূর্তি, বাবরের মূর্তি, মিশরের ফ্যারাও, দেবদেবীর মূর্তি, মাদল বাদরত শিল্পী, দোল উৎসব, দুর্গা মাতার মূর্তি, কবির, গুরুনানক, সুমেরীয় সভ্যতা, গ্রাম বাংলার শিব পুজো, কুমোর পাড়ার গরু গাড়ি, বকাসুর বধ, ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ফুলের কাজ ইত্যাদির চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। এছাড়া ইংরেজ সৈন্য, কামানের ব্যবহার, যুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্যের স্থান পেয়েছে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'হুগলী জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে বলেছেন, "মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে মাটির ফলকের উপর ফুল ও উদ্ভিজ্জের অলংকরণ, বারান্দার ভিতরের ছাদে জ্যামিতিক ও বহুবিধ নকশা পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিটি ফলকের বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গিতে সজীবতা, সাবলীলতা ও বিস্ময়কর মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে এই মন্দিরের সঙ্গে গুপ্তিপারার বিখ্যাত বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দিরের সাদৃশ্য আছে"[3]। মন্দিরের ভিতরে আছে রাধা - কৃষ্ণের মূর্তি। নিয়ম করে প্রতিদিন মন্দিরে পুজো হয়। মন্দিরের টেরাকোটার চিত্র গুলি দেখলে মনে হয় প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প কতটা উন্নত ছিল তা বোঝা যায়। প্রাকৃতিক কারণে এই মন্দির কিছুটা ক্ষয়ে গেছে, তবে বর্তমানে ভালো অবস্থায় আছে। এই মন্দির পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের হুগলী জেলার ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক গ্রন্থে রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা হল : "The Radha-Govinda temple in the village is the largest of the terracotta-decorated temples of Hooghly District. It is comparatively late, 1780 sak\ but the terracotta still show grate liveliness. It is an 8 Chala with a projecting porch covered on all three sides with terracottas decoration. The five great battle scenes above the archways include a splendid Chandi fighting the demon army. The mythological frieze near the ground level includes scenes from the Mahabharat as well as the usual Krishnalila"[4]।

রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে আছে আরও পাঁচটি শিব মন্দির, একটি দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ। এই পাঁচটি শিব মন্দির হল – সীতারাম, বাণেশ্বর, জলেশ্বর, ফুলেশ্বর ও গঙ্গাধর। এগুলো অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ও শেষ দিকে নির্মিত। রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাশাপাশি যে পাঁচটি শিব মন্দির আছে, তাঁর মধ্যে অন্যতম হল সীতারাম মন্দির। মন্দিরটি খুবই পুরানো ও ছোট আকৃতি এবং উচ্চ ভিত্তিবেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখতে আটচালা ধরনের। এই মন্দিরের টেরাকোটা অলংকরণ সর্ববৃহৎ এবং রাধাগোবিন্দ মন্দিরের ধাঁচেই এই মন্দিরের টেরাকোটা আভাস কিছু মেলে। মন্দিরটি পূর্বমুখী। মন্দিরের সামনে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। সামনের দেওয়ালে টেরাকোটার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। এর মধ্যে কিছু ফলক নষ্ট হয়ে গেছে। খিলান দুটির উপরে আটটি করে প্রতীক শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ এবং মাঝের খিলানটির উপরে বারোটি শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের উল্টো দিকের দেওয়ালে সামান্য টেরাকোটার কাজ আছে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলক থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৬৯৫ শকাব্দে (১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ) তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সীতারাম মিত্র।

এই সীতারাম মন্দির থেকে একটু দূরে গেলে চোখে পড়বে বাণেশ্বর শিবমন্দির। মন্দিরটি আটচালা রীতিতে তৈরী এবং উচ্চ ভিত্তিবেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের দরজা একদ্বারবিশিষ্ট। সামনের দিকে টেরাকোটার চিত্র লক্ষ্য করা যায় যেমন দশটি প্রতীক শিবমন্দির এবং তাঁর মাঝে শিবলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া বড় দুটো ফুল ও ডাল – লতা পাতা ছাড়া আর কোনো অলংকরণ নেই। মন্দিরের কিছু ফলক নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরের কোনো প্রতিষ্ঠা ফলক নেই। বর্তমানে মন্দিরটি স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় আছে। এই মন্দিরের পাশে অবস্থিত রাধাগোবিন্দের দোলমঞ্চ। আটচালা দোলমঞ্চটি উঁচু ভিত্তি বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখতে পঞ্চরত্ন ধরনের, যা বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের ধাঁচে লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় চূড়াটি উঁচু, প্রতিটি চূড়ার উপর থেকে রেখ দেউল ধরনের আড়াআড়িভাবে খাঁজ কাটা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। "চারদিকে চারটি স্তম্ভের উপর দোলমঞ্চটি দন্ডায়মান এবং স্তম্ভগুলি পরস্পর ধনুকাকৃতি খিলানের দ্বারা সংযুক্ত"[5]। রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূর্ব দিকে অবস্থিত অষ্টকোণযুক্ত সাদা লাল রঙের রাসমঞ্চ। এটি দেখতে আটটি খিলান ভাবে সংযুক্ত এবং দুই খিলানের মাঝের অংশের উপরে অলংকরণের কাজ আছে। এটি উঁচু ভিত্তিবেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর উপরের আটটি

চূড়ার মধ্যে কেন্দ্রীয় চূড়াটি উঁচু। এখানে রাস উৎসব পালিত হয়। উৎসবের সময় রাধাগোবিন্দ মন্দির থেকে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ রাসমঞ্চে আনা হত।

রাধাগোবিন্দজিউ মন্দিরের পাশ দিয়ে যে রাস্তা বয়ে গেছে, সেই রাস্তার বিপরীতে অবস্থিত জলেশ্বর ও ফুলেশ্বর নামে দুটি শিবমন্দির। এই দুটো মন্দির পাশাপাশিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটি পূর্বমুখী ও অপরটি পশ্চিমমুখী। দুটো মন্দির উচু ভিত্তি বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত, এক দরজা বিশিষ্ট ও প্রথাগত আটচালা শ্রেণীর। এই দুটো মন্দিরের সামনে ও পিছনের কোনো টেরাকোটার চিত্র নেই। একমাত্র বাঁকানো কার্নিশের নিচে টেরাকোটার কাজ আছে। পূর্বমুখী মন্দিরের কোনো প্রতিষ্ঠা ফলক নেই কিন্তু পশ্চিমমুখী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলক আছে, তাতে জানা যায় মন্দিরটি ১১৭৬ সালে নির্মিত। এই মন্দিরগুলো ছাড়া আরোও এক শিব মন্দির আঁটপুরে আছে। সেটি হল গঙ্গাধর শিবমন্দির। মূল মন্দির থেকে এই মন্দির উত্তর দিকে অবস্থিত। মন্দিরটি আটচালা শ্রেণীর, এক দরজা বিশিষ্ট এবং উঁচু ভিত্তিবেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের সামনের দিকে টেরাকোটার নকশা আভাস মেলে। পিছনের দেওয়ালে কোনো টেরাকোটার চিত্র নেই। সামনের দরজার উপরে দুটো বড় ফুলের নকশা আবরণযুক্ত। আর দেখা যাচ্ছে বারোটি প্রতীক শিবমন্দির ও তাঁর মধ্যে শিবলিঙ্গ। সামনের দরজার নিচের দুপাশে কোণের দিকে কিছু টেরাকোটা ফলক নষ্ট হয়ে গেছে। দু একটা পশু পাখি ও ফুল লতা-পাতা ছাড়া আর কোনো পোড়ামাটির চিত্র নেই। এই মন্দিরের কোনো প্রতিষ্ঠাফলক নেই।

রাধাগোবিন্দ ও পাঁচটি শিবমন্দির দর্শন করার পর এবার পৌঁছালাম আঁটপুরের আরেক দর্শনীয় স্থান সেটি হল মিত্র বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ। এটি বাংলার প্রাচীন কাঠ খোদাইয়ের অন্যতম নির্দশন। মন্ডপটি দেখতে দো-চালা ও খড়ের চাল এবং বাঁকানো কার্নিশ। খড়ের চালটি উল্টোভাবে দেখলে মনে হবে যেন নৌকার মতন জলে ভাসছে। ভিতরে দেখতে সত্যিই অপূর্ব। বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি, সামাজিক চিত্র, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত ফুটিয়ে তুলেছে। "উপরের কড়িগুলিতে চৌখুপির মধ্যে ফুলের নকশা, থামগুলির উপরিভাগও কারুকার্যমন্ডিত। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত কাষ্ঠ স্থাপত্যের এই বিশিষ্ট ও দুর্লভ নির্দশনটি ধ্বংসের মুখে। এর অনুরূপ আরও একটি কাষ্ঠনির্মিত চণ্ডীমন্ডপ হুগলী জেলায় আছে, সেটির অবস্থান বলাগড় ব্লকের অন্তর্গত শ্রীপুরে" [6] । এখানে বাৎসরিক প্রধান পূজো অর্থাৎ দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। মণ্ডপটি বর্তমানে মোটামুটি ভালো অবস্থাতেই আছে। সরকারি গ্রন্থে এই চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা হল:- "The Chandimandap (lit.pavilion of goddes Chandi) built by Krishnaram is another object of interest in the village. It is a rectangular hall with a thatched dochala roof supported by a wooden framework every member of which is profusly curved. The structure is one of the very few of its kind extant in West Bengal persensing the remains of a forgotton artistry in wood (Hooghly District Gazetteers)"[7]।

ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম আঁটপুর। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কোনো এক দুর্গাপুজোয় রামকৃষ্ণ আঁটপুরে এসেছিলেন। ঐতিহাসিক বকুল গাছের নীচে তিনি ধ্যান মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি 'গদাধর'। এই বকুল গাছটি বর্তমান অবস্থায় জীবিত আছে। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবুরাম ঘোষ ওরফে স্বামী প্রেমানন্দ। তিনি রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য ছিলেন। এই গ্রামের পাশাপাশি আরেক গ্রাম আছে, নাম তড়া। তাই তখন এই গ্রামকে 'তড়া-আঁটপুর' বলা হত। এই তড়া-আঁটপুরে ছিল বাবুরাম ঘোষের বাড়ি। একসময় বাবুরাম যখন দক্ষিণেশ্বর গেলেন, তখন বাবুরামের সাথে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিলো এবং রামকৃষ্ণ বাবুরামকে বলেছিলেন, "তোমাদের দেশে একবার গিয়েছিলাম সেই তড়া-আঁটপুরে"।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট ১৬ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরলোকগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চলে যাবার পর তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর আটজন বন্ধুসহ আঁটপুরে বাবুরাম ঘোষের বাড়িতে অবস্থান করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর ২৪ তারিখে অর্থাৎ বড় দিনের আগের দিন শ্রীরামকৃষ্ণের নয় শিষ্য ধুনি জ্বালিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন - "এরা হলেন - ১) নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), ২) বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ), ৩) শ্রী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ), ৪) শ্রী শশিভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), ৫) শ্রী তারক ঘোষাল (স্বামী

শিবানন্দ), ৬) শ্রী কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), ৭) শ্রী নিত্যরঞ্জন ঘোষ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), ৮) শ্রী গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখন্ডানন্দ), ৯) শ্রী সারদাচরণ মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)"[8] । সারা রাত জ্বলতে থাকে ধুনি। ধ্যানে মগ্ন নয়টি যুবক। শেষ হল ধ্যান, শুরু হলো ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা। বিবেকানন্দ যিশু খ্রিস্টের জীবন কথা নিয়ে শোনালেন। প্রতিবছর এই দিনটিকে স্মরণ করে ধুনি জ্বালানো হয় এবং উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। একটি করে পত্রিকা বের হয় নাম 'ত্যাগবহ্নি'। "দুর্গা মন্ডপের সামনের ডান কোণে ১৯৮১ সালে একিট স্মারকমন্ডপ তৈরি হয়েছে। মন্ডপের গায়ে স্বামী বিবেকানন্দ সহ নয়জন সংকল্প গ্রহণকারী সন্ন্যাসীর খোদাই করা মূর্তি এবং তার চারদিকে টেরাকোটার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও রামকৃষ্ণের ভাবসম্ভার বিষয়ক উনপঞ্চাশটি টেরাকোটার মূর্তির সম্ভার রয়েছে"[9] । ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠে স্বামী প্রেমানন্দের নামে "প্রেমানন্দ ভবন" আছে। বর্তমানে স্বামীজির গুরুভাইরা এখানে অবস্থান করেন। সরস্বতী পুজো এবং শিবরাত্রির দিনে শিবের বিশেষ পুজো আয়োজন হয়। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই গ্রামে সাতদিন ধরে বিরাট মেলা বসে। রমা রলাও রামকৃষ্ণের জীবনীগ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখেছেন : "They were assembled at Antpur in the house of the mother of one of the disciples (Baburam). It was late in the evening when the monks gathered together before the free. Meditation began continuing for a long time. Then a break was made and the leader (Vivekananda) filled the silence with the story of the lord Jesus. The many points of similarly in thought and action as well as the relationship with the disciples, between Christ and Ramakrishna, forcibly brought to their minds the olds days of esctasy with their Master.

Then Vivekananda appealed to the monks. He besought them to becoy Christ's in their turn, to work for the redemption of the world, to renounce all the Jesus had done and to realise God. Standing before the wood fire, their faces reddened by the leaping flames, the cracking of the logs the only sound that broke the stillness of their thoughts, they solemnly took the vows of everlasting Sannyasa, each before his fellows and all in the sight of God"[10]।

**দ্বারহাট্টা:** দ্বারহাট্টা হুগলী জেলার হরিপাল ব্লকের অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। হাওড়া তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল ১৬ তম রেলস্টেশন। হরিপাল স্টেশন থেকে ৬-৭ মাইল দূরে অবস্থিত এই প্রসিদ্ধ গ্রাম। দ্বারহাট্টার নিকটবর্তী গ্রাম পূর্বে হরিপাল ব্লক, উত্তরে তারকেশ্বর ব্লক, পশ্চিমে পুরশুড়া ব্লক, দক্ষিণে জাঙ্গীপাড়া ব্লক ও দক্ষিণ পশ্চিমে উদয়নারায়ণ ব্লক ইত্যাদি বেষ্টন করে আছে। পূর্বে এই গ্রাম দিনেমার ও ওলন্দাজদের বানিজ্যকুঠি ছিল। সুধীরকুমার মিত্র বলেছেন -"১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার তিনটি মহকুমায় বিভক্ত হয়। সদর দ্বারহাট্টা ও ক্ষীরপাই। দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রয় করলে এটা হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দ্বারহাট্টা মহকুমার পরিবর্তন করে শ্রীরামপুর মহকুমা করা হয়"[11]।

কানা-দামোদর নদী এই গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদী বর্ধমানের জামালপুর গ্রাম থেকে বেরিয়ে হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়ার কাছে মিশেছে। বর্ষাকালের সময় এই নদীতে ছোট বড় নৌকায় যাত্রীরা নদী পারাপার করে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য। নদীতে জল শুকিয়ে গেলে স্থানীয় পঞ্চায়েতরা বাঁশের মাচা ও সাঁকো তৈরি করে। তার উপর দিয়ে মানুষ পায়ে হেঁটে ও যানবাহনে করে চলাচল করে। এই গ্রামে ছোট আকারে তাঁত শিল্প বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরা এখানে একটি কারখানা স্থাপন করেছিলেন। পরে কোম্পানির এজেন্সি রাজবলহাট থেকে স্থানান্তরিত হয়।

দ্বারহাট্টা গ্রামে দ্বারিকাচণ্ডীর মন্দির ও রাজরাজেশ্বর মন্দির কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামে প্রাচীন দেবতা ছিলেন দ্বারিকাচণ্ডী। তাঁর নামানুসারে দ্বারহাট্টা নামকরণ করা হয়। দ্বারিকাচণ্ডী মন্দির আগে টেরাকোটা ছিল। মোহিনী মোহন সিংহ রায়ের পূর্ব পুরুষরা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের গায়ে প্রস্তর ফলকে লেখা আছে যে মন্দিরটি

১১২৬ সালে স্থাপিত হয়। মন্দিরের গায়ে অনেক টেরাকোটা অলংকরণ ছিল। সেগুলো আস্তে আস্তে খসে পড়ে যায়। তারপর গ্রামবাসীরা মন্দিরটি হারানো সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। নুতন করে ৬ ই আশ্বিন ১৪১৩ সনে মন্দিরটি গড়ে তোলা হয়। বর্তমান মন্দিরের গায়ে কোনো টেরাকোটা অলংকরণ নেই। দু একটা অবশিষ্ট টেরাকোটা আছে। মন্দিরটি আটচালা, দেখতে লাল রঙের এবং উচ্চ ভিত্তি বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে শ্রী শ্রী দ্বারিকাচণ্ডী প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ম করে পূজো হয়। দ্বারিকা চণ্ডী আসলে চতুর্ভূজা দুর্গা মূর্তি। দেবীর সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। "দুর্গা পুজোর সময় দ্বারিকাচণ্ডী বলিদান হবার পর চারপাশে দশ বারোটি গ্রামে পুজোর বলিদান হয়। এই নিয়ম বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে"[12]।

দ্বারিকাচণ্ডীর পর দ্বিতীয় টেরাকোটা মন্দির হল শ্রীশ্রী রাজরাজেশ্বর মন্দির। এই মন্দির দ্বারহাট্টা গ্রামে বাবুপাড়ায় অবস্থিত। অপূর্বমোহন সিংহরায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা ফলকে লেখা আছে মন্দিরটি ১১৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অপূর্ব মোহন সিংহ রায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করে জমিদারি হন। তিনি দান, পূজা পার্বণ, পুকুর, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি করে তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মন্দিরটি ত্রিখিলানবিশিষ্ট, প্রথাগত আটচালা এবং উচ্চ ভিত্তি বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের সামনের দিকে দেওয়ালে, দুই দিকে খিলানের উপর অনেক টেরাকোটা চিত্র লক্ষ্য করা যায় - রাম রাবণের যুদ্ধ, দুর্গা, কালী, ইংরেজ সৈন্যদল, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ইত্যাদি। এছাড়া আরও কিছু কিছু টেরাকোটা নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরের ভিতরে আছে দেবতা শ্রীশ্রী রাজরাজেশ্বর (শালগ্রাম শিলা) প্রতিষ্ঠিত ও নিত্যপূজিত। এই সিংহ রায় বংশের প্রবীণতম ব্যক্তি ফকিরচন্দ্র সিংহরায় বলেন, "সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজস্থানের যোধপুর থেকে এদের পূর্বপুরুষ এখানে এসে বসবাস করেন। মানসিংহের বোনের সঙ্গে আকবরের বিবাহের পর বহু ছত্রী সেই সময় জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থান থেকে বাংলাদেশে চলে আসেন"[13]। প্রতি বছর এখানে বিরাট শিবের গাজন মেলা বসে এবং পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

**তথ্যসূত্র** :


১) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৯২৯
২) প্রণব রায়, বাংলার মন্দিরচর্চা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ১১৪
৩) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হুগলী জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট ১৯৯৩, পৃষ্ঠা – ৩৮
৪) 'হুগলী ডিস্ট্রিক সেন্সাস হ্যান্ডবুক' গ্রন্থ, সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৯৩৪
৫) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হুগলী জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা – ৩৮
৬) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হুগলী জেলার পুরাকীর্তি, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা – ৩৮
৭) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, (হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার), দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৯৩৪
৮) শ্রী রাম রবীন্দ্র ঘোষ, আঁটপুর ও রাজবলহাট, ক্যাম্প প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা – ৩১
৯) শ্রী রাম রবীন্দ্র ঘোষ, আঁটপুর ও রাজবলহাট, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা – ৩১
১০) শ্রী রাম রবীন্দ্র ঘোষ, আঁটপুর ও রাজবলহাট, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা – ৩৩
১১) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস, পৃষ্ঠা –১০৮৩
১২) সুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা – ১০৮৪
১৩) সুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা – ১০৮৪